পঞ্চম অধ্যায় (5d)

মহাযাত্রার পদচিহ্ন

(মিসিং লিংকগুলো আর মিসিং নেই)

বন্যা আহমেদ
Email: bonna_ga@yahoo.com

পূর্ববর্তী পর্বের পরঃ

ফসিলের কথা লিখতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্লেট টেকটনিক্স, মহাদেশীয় সঞ্চরণ, রেডিওঅ্যাকটিভ ডেটিংসহ এন্তার বিষয়ের আলোচনা চলে এসেছে এই অধ্যায়ে। তবে এবার বোধ হয় অধ্যায়টি শেষ করার সময় এসেছে, চলুন, বিবর্তনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের আলোচনার মধ্য দিয়েই ইতি টানা যাক ফসিলের আলোচনার। তত্ত্বকথা তো অনেক হলো এই অধ্যায়ে, তাই এবার চেষ্টা করবো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে না ঢুকে এক্কেবারে সহজ ভাষায় মিসিং লিঙ্ক বা মধ্যবর্তী ফসিলের ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করার। 'মিসিং লিঙ্ক' কথাটা বহুলভাবে প্রচলিত হলেও এটা কিন্তু ঠিক বৈজ্ঞানিক কোন শব্দ নয়। এই মিসিং লিঙ্কগুলো হচ্ছে জীবের বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তরের এমন কিছু ফসিল যারা তাদের আজকের আধুনিক প্রজাতি এবং তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিশাল কোন গ্যাপ বা ফাঁক পুরণ করে। অর্থাৎ, আগের প্রজাতি এবং তার থেকে বিবর্তিত হওয়া পরের প্রজাতি - এই দুই প্রজাতি বা ট্যাক্সোনমিক (Taxanomic, শ্রেনীবিন্যাসগত) গ্রুপেরই কিছু কিছু বা মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে এমন জীবের ফসিলকে মধ্যবর্তী ফসিল (Transitional Fossil) বা সাধারণভাবে মিসিং লিঙ্ক বলা হয়।

বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই ধারণা করে আসছেন যে, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সেই ডায়নোসরগুলো থেকেই নাকি আজকের আধুনিক পাখির উৎপত্তি ঘটেছে, কিন্তু বললেই তো হল না, এটা তো আর মুখের কথা নয়, কোথায় ডায়নোসর আর কোথায় পাখি! ডায়নোসর কথাটা শুনলেই আমাদের মনে যে দৈত্যের মত দেখতে প্রাণীগুলোর চেহারা ভেসে ওঠে তাদেরকে দোয়েল বা ময়নার মত গোবেচারী পাখিগুলোর পূর্বপুরুষ বানিয়ে দিলেই হল নাকি? কিংবা ধরুন, বেশীরভাগ প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস বেশ সহজেই নির্ধারণ করা গেলেও তিমি (মাছ!) বা ডলফিনদের নিয়ে বডড বিপাকে পড়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। কি সৃষ্টি ছাড়া জীবই না এই বিশাল বপু সামুদ্রিক প্রাণীগুলো! সমুদ্রেই থাকে ষোল আনা সময়, সাতরে বেড়ায় মাছের মতই, কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে তো এদেরকে কোনভাবেই মাছ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না! মাছের কি এদের মত ফুসফুস থাকে নাকি তারা বাচ্চা প্রসব করে? আসলে তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু তাহলে তারা পানিতে নেমে এলো কখন বা কি করে? বিজ্ঞানীরা যখন বললেন, এরা আসলে ডাঙ্গার জীবন থেকে সমুদ্রে বিবর্তিত হয়েছে তখন কি মহা হইচইই না পড়ে গিয়েছিলো চারদিকে! বিবর্তনবাদ বিরোধীরা রীতিমত দাবী করতে শুরু করলো মিসিং লিঙ্কগুলো দেখাও, আর না হলে এরকম ভাওতাবাজী বন্ধ কর, মাটি থেকে তিমি মাছের পূর্বপুরুষের পানিতে বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপগুলো দেখাতে না পারলে এই দাবীর কোন যৌক্তিকতাই নেই! ব্যাপারটা আসলেই তো গুরুত্বপূর্ণ, প্রকৃতিতে এরকম বড় বড় পরিবর্তন যদি ঘটেই থাকে এবং বিবর্তনের নিয়মানুযায়ী অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি বছর ধরেই তা যদি ঘটে থাকে,তাহলে তো তাদের বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল বা অন্য কোন প্রমাণও তো থাকতে হবে! এরকম উদাহরণ কিন্তু বিবর্তনবাদের জগতে অনেকই আছে, তাদের সম্পর্কে এই প্রশ্ন জাগাই স্বভাবিক যে কোথায় গেলো মাঝামাঝি স্তরের প্রাণীগুলো বা তাদের মধ্যবর্তী ফসিলগুলো?
আমরা জানি যে, মূলত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বছরের ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে এক

প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে। আমরা আগে এও দেখেছি যে, এক প্রজাতির বিভিন্ন জীবদের মধ্যেই বিভিন্ন রকমের প্রকরণ থাকে, ধীর গতিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারায় অধিক সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অংশটি হয়তো দ্রুত গতিতে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তার ফলে প্রজাতির এই অংশের মধ্যে এই ধরনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হতে হতে এক সময় তারা উপ-প্রজাতিতে পরিণত হয়ে যায় (১)। এই নতুন উপ-প্রজাতির বেশ কয়েক রকমেরই পরিণতি হতে পারে - তারা এরকম একটা উপপ্রজাতি হয়েই চিরতরে টিকে থাকতে পারে, বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে, অথবা আবার বিবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। আর যদি প্রজাতির একটি অংশ তার মুল প্রজাতি থেকে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিবর্তনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তরান্বিত হতে পারে। নিজস্ব গতিতে বিবর্তিত হতে হতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের থেকে এতই বদলে যায় যে, তাদের মধ্যে আর প্রজনন ঘটা সম্ভব হয় না। সাধারণত, তখনি আমরা তাদেরকে নতুন প্রজাতি বলে ধরে নেই।

তারপর এই নতুন প্রজাতি এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা বিবর্তনের ধারায় নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে, ফলে বিলুপ্ত হয়ে না গেলে ক্রমাগতভাবে নতুন প্রজাতির সাথে তার পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্যগত বিচ্ছিন্নতা বাড়তেই থাকে। কোটি কোটি বছরের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে এক সময় তাদের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াতে পারে যে এরা একসময় সম্পর্কযুক্ত ছিলো তা নির্ধারণ করাই হয়তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় আমাদের সেই ফসিল রেকর্ডই ভরসা, মধ্যবর্তী যে স্তরগুলো তারা পার করে এসেছে লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়, তার প্রমাণগুলো লুকিয়ে আছে সেই প্রাণীগুলোর অতীতের ফসিলের মধ্যে। যেমন ধরুন, আমার জানি যে, জলের প্রাণীর থেকেই বিবর্তিত হয়ে ডাঙ্গার প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছিলো প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান যুগে। এটা তো আর রাতারাতি ঘটেনি। বিবর্তনের তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে ধাপে ধাপে এই পরিবর্তন ঘটেছে, ধীরে ধীরে পানি থেকে উঠে এসে লক্ষ কোটি বছরের ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে মাটির জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য রূপান্তরিত হতে হয়েছে তাদের। সেভাবে হিসেব করলে তো নিশ্চয়ই একটা সময় ছিলো যখন পা বা কোন অংগের উপর ভর করা মাছের বিবর্তন ঘটেছিলো যারা হয়তো পানি এবং মাটি দু'জায়গাতেই আংশিকভাবে টিকে থাকতে পারতো, যাদের থেকেই হয়তো এক সময় উভচর প্রাণী এবং পরে সরীসৃপের বিবর্তন ঘটেছে। নিশ্চয়ই তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালের পরিণতিতে একসময়ে। অনেকদিন পর্যন্ত এরকম কোন ফসিল পাওয়া না গেলেও বিজ্ঞানীরা একরকম নিশ্চিতই ছিলেন যে এই পথেই বিবর্তন ঘটেছে মাটিতে বাস করা প্রাণীগুলোর। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা প্রায়ই ফসিল রেকর্ডের এই গ্যাপ বা ফাঁকটি তুলে ধরে বিবর্তন তত্ত্বের ত্রুটি প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। তাদের মুখে ছাই দিয়ে, গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা মাছ থেকে উভচর প্রাণীর বিবর্তনের প্রায় প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী ধাপের ফসিলই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই তো কিছুদিন আগে ২০০৬ সালের প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা চার পাওয়ালা এমনই এক মাছের ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন যা দিয়ে আসলে এখন এই বিবর্তনের মোটামুটি প্রত্যেকটা ধাপই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে আমাদের সামনে। এ রকম ধরণের গুরুত্ত্বপুর্ন মিসিং লিঙ্কগুলোর আবিষ্কার বিবর্তনের তত্ত্বকে শুধু যে শক্তিশালীই করেছে তাই নয়, বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যে কতখানি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাও জোরালোভাবে প্রমাণ করে ছেড়েছে। চলুন তাহলে এবার এরকম কিছু উদাহরণ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

পাখি তাহলে ডায়নোসরেরই উত্তরসুরি!ঃ ১৮৫৯ সালে ডারউইন যখন বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন তখন পাখির বিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে কিন্তু তিনি বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। বিবর্তনের অনুক্রমে পাখি ঠিক কোথায় পড়বে? আপাতদৃষ্টিতে এখনকার বা জানামতে আগেকার কোন প্রাণীর সাথেই তো

এর তেমন মিল পাওয়া যাচ্ছে না! অনেকেই তখন এই দুর্বলতাটকে কাজে লাগিয়ে বিবর্তন তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ডারউইনের আমরণ বন্ধু, হ্যা, আমাদের সেই থমাস হাক্সলি (যাকে কিনা ডারউইনের 'বুল ডগ' বলে ডাকা হত) আবারও এগিয়ে এলেন তাকে সেই যাত্রায় রক্ষা করতে। ১৮৬০ সালে বিজ্ঞানীরা প্রায় ১৫ কোটি বছরের পুরনো জুরাসিক যুগের এক্কেবারে শেষের দিকের সময়ের কোন এক অজানা জীবের পালক আবিষ্কার করেন। তার পরের বছরই তারা জার্মানীতে খুঁজে পেলেন অদ্ভুত একটি প্রাণীর ফসিল - আরকিপটেরিস (*Archaeopteryx*) - একদিকে তার যেমন আছে পাখির মত পাখা এবং পালক, আবার অন্য দিকে দিব্যি পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে ডায়নোসরের মত লম্বা লেজ এবং দাঁতয়ালা চোয়ালের অস্তিত্ব। তবে তার মধ্যে আধুনিক পাখির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও বেশীর ভাগ বৈশিষ্ট্যই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডায়নোসর থেরাপডের (therapod) সাথেই বেশী মিলে যায় (২)। এই আরকিপটেরিস এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া মিসিং লিঙ্ক বা মধ্যবর্তী ফসিলের মধ্যে সবচেয়ে বহুলভাবে আলোচিত একটি ফসিল। হাক্সলি সেই সময়েই সদ্য পাওয়া যাওয়া এই ফসিলটি পরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে, আসলে পাখিগুলো হয়তো একধরণের ডায়নোসর থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। সেদিন ফসিলবিদ্যার জগতে মহা হইচই পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটি নিয়ে। তারপর আরও বেশ কয়েকটি এ ধরণের ফসিলই পাওয়া গেছে গত প্রায় দেড়শো বছরে। কিন্তু তাদের সবারই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাখির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও বেশীরভাগ বৈশিষ্ট্যই ছিলো একধরনের ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসর বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি(৩)। তাই খুব পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা তাদের ডায়নোসর থেকে পাখির বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটিকে এতদিন তত্ত্বে রূপ দিতে পারছিলেন না। আরও কিছু মধ্যবর্তী ফসিলের অস্তিত্ব না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত এই গোলমেলে ব্যাপারটা নিয়ে শেষ সিদ্ধান্তে পৌছুনো একটু কঠিনই হয়ে যাচ্ছিলো।

আরকিপটেরিসের ফসিল
সৌজন্যঃ
http://www.ruf.rice.edu/~queller/Bios334/links.htm

দেড় শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে বিজ্ঞানীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে ব্যাপারটার একটা দফা রফা হতে চলেছে। গত কয়েক বছরে চায়নায় যে অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে তারা থেরাপড ডায়নোসর থেকে ক্রমান্বয়ে পাখিতে রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে আমাদের চোখের সামনে। সম্প্রতি চায়নায় পাওয়া যাওয়া সায়নোসরপটেরিক্সের ফসিলের গায়ে ছোট ছোট পালকের নমুনা পাওয়া গেছে, কডিপটেরিক্সের হাতে এবং লেজে পাওয়া গেছে বেশ চওড়া ধরণের পালক, আবার বিজ্ঞানীরা মায়ক্রোর‍্যাপ্টর গুই নামে এক অদ্ভুত চার পাখাওয়ালা ডায়নোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছেন যার সবগুলো পাখায়ই উড়ার সহযোগী পালক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে (নীচের ছবিতে দেখুন)।

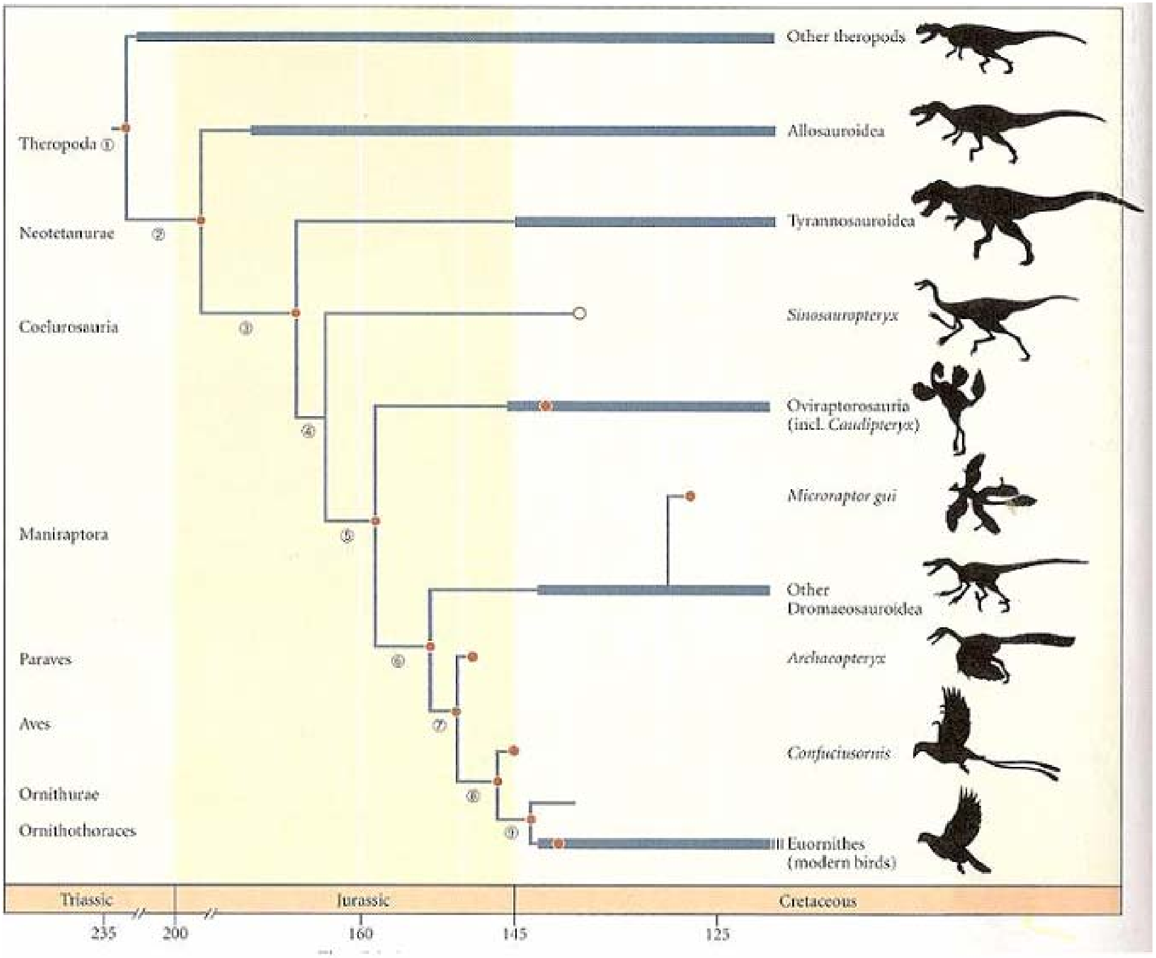

সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হওয়া বিভিন্ন ধরণের থেরাপড ডায়নোসরের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে উপরের ছবিতে (৩)

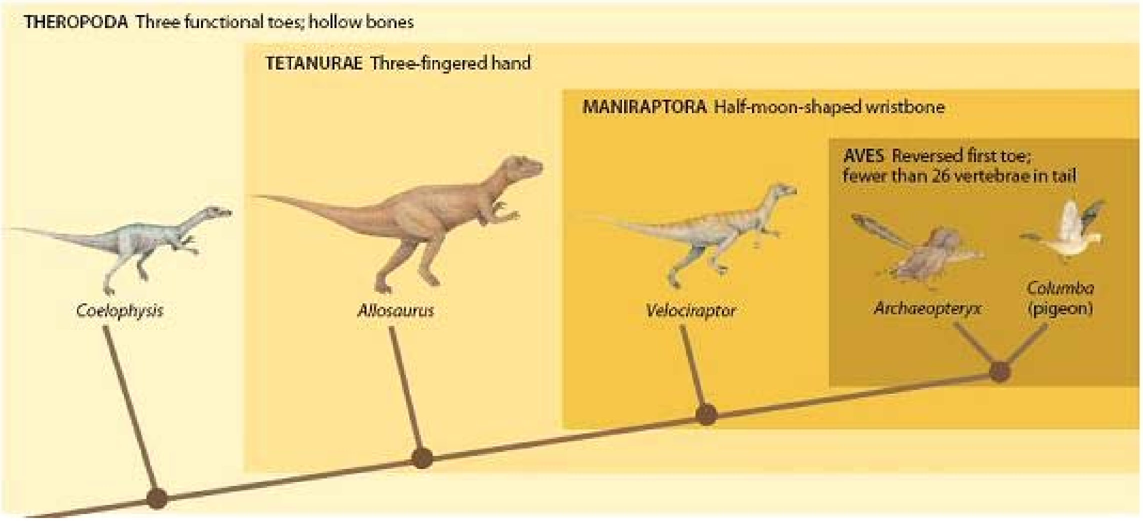

থেরাপড ডায়নোসর থেকে আধুনিক পাখির বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের ছবি।

সৌজন্যঃ Scientific American, Feb 1998, 'The Origin of Birds and their Flight', by Padian & Chiappe

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের পালকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া গেছে এই ফসিলগুলোর মধ্যে। আসলে পাখিতে বিবর্তিত হওয়ার অনেক আগেই বিভিন্ন ধরণের থেরাপড ডায়নোসরের মধ্যে পালকের উদ্ভব ঘটে। পালক বা পাখা থাকলেই যে ওড়া যাবে তাও তো নয়, ওড়ার জন্য এক ধরনের বিশেষ ধরণের পালকের প্রয়োজন হয়। তাই পালকের উন্মেষ ঘটার অনেক পরে বিশেষ ধরণের অপ্রতিসম আকারের পালকের বিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত আসলে এই ডায়নোসরগুলোর পক্ষে উড়াল দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ধরণের যত নতুন নতুন ফসিলের আবিষ্কার হচ্ছে ততই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন যে, আরকিপটেরিসের অনেক আগেই ডায়নোসরদের মধ্যে তথাকথিত পাখিসুলভ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছিলো, যেমন ধরুন সরু সরু হাত পার গঠন, বা পালকের বিবর্তন। আবার আধুনিক পাখিগুলোর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, লেজের হাড়ডিগুলোর জোড়া লেগে ছোট হয়ে যাওয়া, দাঁত বা হাতের নখরের বিলুপ্তি

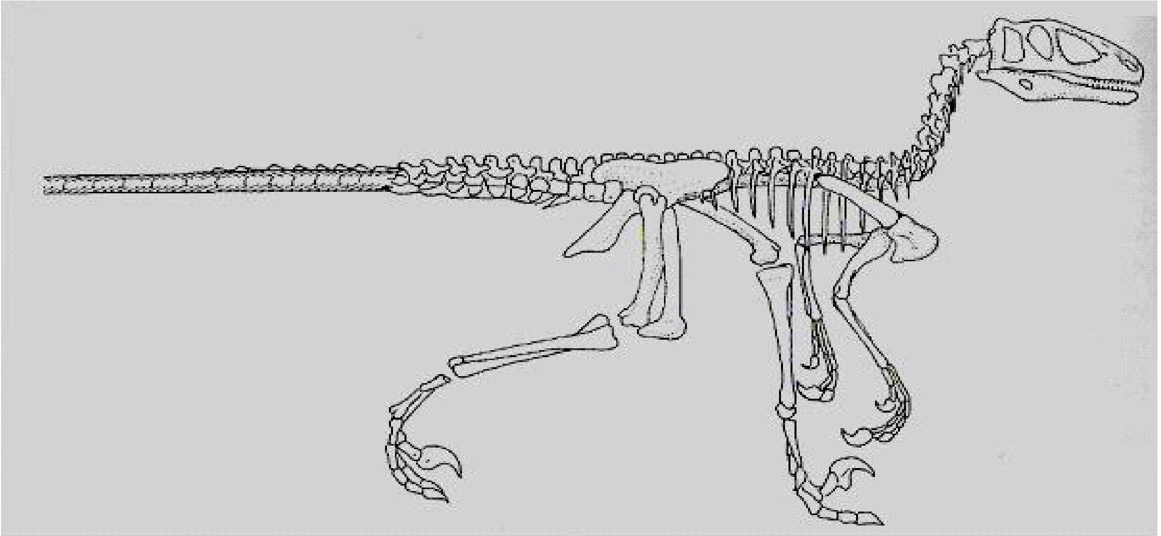

ক. থেরাপড ডায়নোসর (১৫)

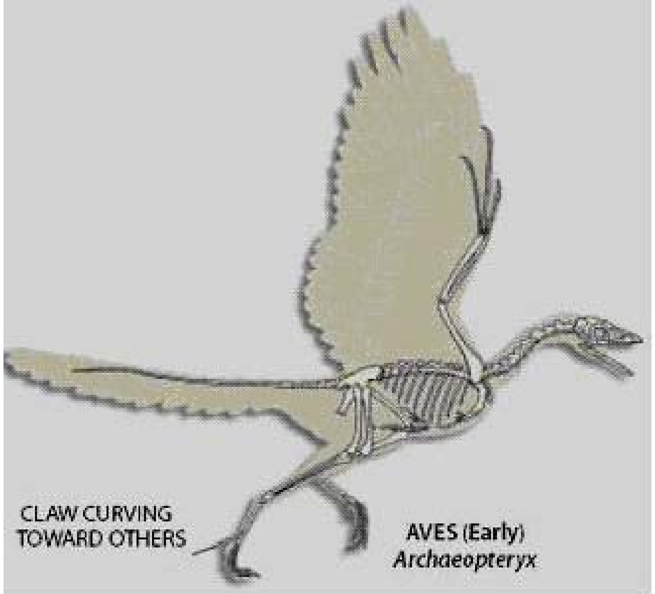

খ. আরকিপটেরিস (*Archaeopteryx*) (১৫)

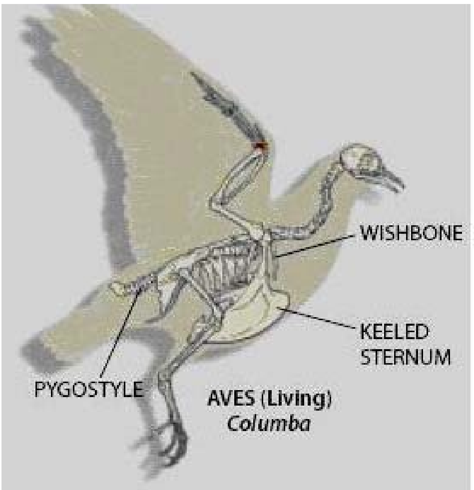

গ. আধুনিক পাখি (*Aves)* (১৫)

ঘটার মত ঘটনাগুলো ঘটেছে আরকিপটেরিসেরও বেশ পরে। থেরাপড ডায়নোসরের সাথে আরকিপটেরিস এবং আধুনিক পাখীর শারীরিক গঠনের তুলনামুলক চিত্রটি (উপরের ছবিতে দেখুন) দেখলে বিবর্তনের এই পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো বেশ পরিষ্কারভাবে ধরা পরে। এই তুলনামুলক পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা যে শুধু ডায়নোসরের সাথে আধুনিক পাখির বিবর্তনের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন তাইই নয়, এই পরিবর্তনগুলো কিভাবে ঘটেছিলো তা সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিছুদিন আগে ঘুমন্ত অবস্থায় ফসিল হয়ে যাওয়া হাঁসের মত আকারের এক ধরণের ডায়নোসরের ফসিল পাওয়া গেছে যাকে দেখলে মনে হবে আজকের দিনের কোন পাখি যেনো ঘুমিয়ে আছে তার শরীরের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে(৪)। এইসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পাখি হিসেবে

চায়নার উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যাওয়া ঘুমন্ত ডায়নোসরের ফসিল এবং হাতে আঁকা সম্ভাব্য প্রতিকৃতি। (৪)

বিবর্তিত হওয়ার অনেক আগেই সেই প্রাচিন ডায়নোসরদের মধ্যেই তথাকথিত পাখিসুলভ বৈশষ্ট্যগুলো দেখা দিতে শুরু করে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে - মোটেও ওড়ার জন্য ডায়নোসরের মধ্যে পালকের বিবর্তন ঘটেনি, এর উদ্ভব ঘটেছিলো নিতান্তই তাদের চামড়ায় ঘটা এক বিশেষ পরিবর্তনের ফলে। এর পর তাপ সংরক্ষেণে সুবিধা করে দেওয়ার মাধ্যমে বা অন্য যে কারণেই হোক তা তাদেরকে টিকে থাকতে বাড়তি কোন সুবিধা জুগিয়েছিলো বলেই এই বৈশিষ্ট্যটি টিকে গিয়েছিলো থেরাপড ডায়নোসরগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ উড়ার জন্য পালকের উদ্ভব ঘটেনি, বরং ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো - কোন এক মিউটেশন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে হঠাৎ করেই পালকের উৎপত্তি ঘটে আর তারই ফলশ্রুতিতে এক সময় কোন এক পরিস্থিতে ডায়নোসরগুলো উড়তে সক্ষম হয়। সৃষ্টতত্ত্ববাদীরা যদিও বলে থাকেন, পৃথিবীর সব কিছুই নাকি নীল নক্সা অনুযায়ী প্ল্যান করে তৈরি করা হয়েছে, অর্থাৎ পাখি উড়বে বলেই নাকি পরিকল্পনা করে তার শরীরে পালকের সৃষ্টি করা হয়েছে! কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাকৃতিতে কিছুই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি নয়, কেমন যেনো এলোমেলোভাবে উদ্দেশ্য ছাড়াই তাদের উৎপত্তি ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মেই। আর কোটি কোটি বছর ধরে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ক্রমাগতভাবে ঘটতে থাকা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উৎপত্তি হয়েছে এতো রকমের প্রাণের, এত রকমের উন্নত এবং জটিল সব জীবের। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী রিচার্ড ডকিনস ঠিকই বলেন 'আমাদের চারপাশে বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন অশুভ কিংবা শুভের অস্তিত্ব আসলে অন্ধ, কেবল করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না' (১০)। ডায়নোসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে পালকের উদ্ভব, সেখান থেকে ধীরে ধীরে কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে উড়তে পারা পাখির বিবর্তন আবারও আমাদেরকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতাকে মনে করিয়ে দেয়। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যে বিভিন্ন ধরণের জটিল এবং উন্নত প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব তারই এক চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে চলেছে ডায়নোসর থেকে পাখির এই বিবর্তনের কাহিনী।

পা ওয়ালা মাছের ডাঙ্গায় উঠে আসাঃ প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে প্রাণীজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে যেনো এক বিপ্লব ঘটে গেলো। প্রায় একশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর মাটিতে আদি কোষী জীবের অস্তিত্ব দেখা গেলেও তা শুধু বিভিন্ন ধরণের সরল ধরণের জীবাণুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ৪৭-৫৫ কোটি বছর আগে প্রথমবারের মত পৃথিবীর মাটিতে আদি উদ্ভিদ এবং ফার্নের অস্তিত্ব দেখা দেয় কিন্তু তখনও প্রাণীর বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিলো শুধুমাত্র জলেই, ডাঙ্গায় উঠে আসার আয়োজন আসলে শুরু হয়েছিলো তারও অনেক পরে (৫)। ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান যুগে জল থেকে ডাঙ্গায় প্রাণীর বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ডেভোনিয়ান যুগটি ছিলো খরার যুগ, পানির উচ্চতা কমে আসছিলো তখন পুকুর, নদী, সমুদ্রে। আর এ সময়েই এক ধরণের মাংসল পিন্ডের মত পাখনা বিশিষ্ট (Lobe Finned Fish বলা হয় এদেরকে, Lungfish এবং Coelocanth উভয়েই এই দলের অন্তর্ভুক্ত; আর এখন আমরা যে আধুনিক মাছ দেখি তার বেশীর ভাগই ছড়ানো পাখা বিশিষ্ট মাছের উত্তরসুরী যাদেরকে বলে Ray Finned Fish) এক ধরণের মাছের বিবর্তন ঘটে, তাদের এই মাংসল পাখনার সাথে চতুষ্পদী প্রাণীর হাত পা'র প্রচুর মিল রয়েছে। ফুলকার সাহায্যেই বেশীর ভাগ সময় শ্বাস প্রশ্বাস চালালেও ফুসফুসের সাহায্যে তারা আবার মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতেও সক্ষম ছিলো। অর্থাৎ ডেভোনিয়ান যুগের খরার সময় তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো অল্প পানিতে বা পানির মাঝখানের শুকনোয় চলে ফিরে বেড়াতে সাহায্য করেছিলো(৬)। আর ওদিকে খরা যত বাড়তে থাকলো, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই, ততই এ ধরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীগুলোই টিকে থাকার জন্য বিশেষ সুবিধা পেতে থাকলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ডাঙ্গায় উঠে আসার জন্য কিন্তু চতুষ্পদী প্রাণীর মধ্যে হাত পার উদ্ভব ঘটেনি, এর বিবর্তন ঘটেছিলো ক্ষরার সময় পানিতে টিকে থাকার জন্য, যা পরবর্তীতে তাদেরকে ডাঙ্গার জীবনে অভিযোজিত হতে সাহায্য করেছিলো। একই ধরণের ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছিলাম পাখা এবং পালকের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও, উড়ার জন্য তাদের উৎপত্তি ঘটেনি, কিন্তু পরবর্তীতে তাই ডায়নোসরদের উড়তে সাহায্য করেছিলো। অনেকে মনে করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগে মাটিতে উদ্ভিদের ব্যাপক বিকাশও সাহায্য করেছিলো প্রাণীদেরকে মাটিতে উঠে আসতে। পানির ধারে মাটিতে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ এবং তাদের পানিতে ছড়িয়ে থাকা মূলগুলো বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্য হিসেবে কাজ করেছিলো।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানীরা মাছ থেকে উভচর প্রাণীতে রূপান্তরের এই ধীর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের প্রাণীরই ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকার মাদাগাস্কারের উপকুল এলাকায় এমন এক জীবন্ত মাছ

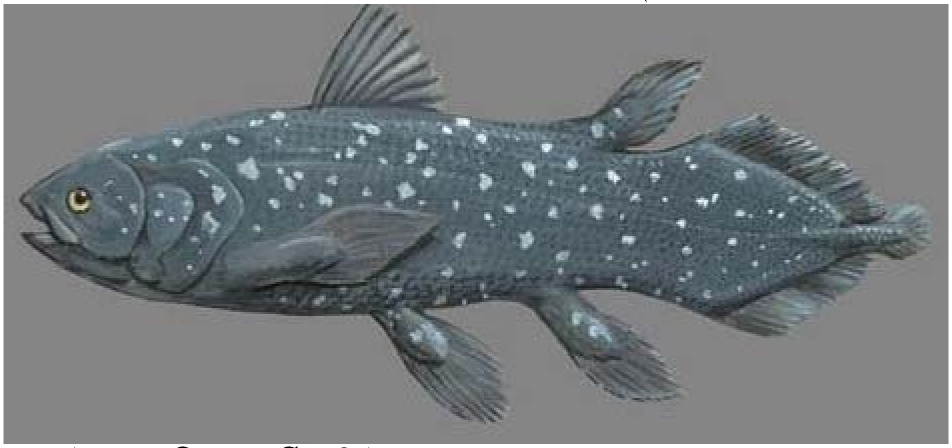

মাছ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাছঃ coelacanth: *Laimeria chalumnae*
সৌজন্যঃ University of Michigan: Museum of Zoology
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_fish/Coelacanthiformes/Latimeria_chalumnae.jpg/view.html

(*Laimeria chalumnae*) ধরা পড়ে যাকে ৭-৮ কোটি বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করা হত। এর মধ্যে মাছ থেকে উভচর প্রাণীর বিবর্তনের এতগুলো মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যে, একে যেনো রীতিমত এক 'জীবন্ত ফসিল'ই বলা যায়। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিজ্ঞানীরা এই মিসিং লিঙ্কটিকে 'অতীতের সময় পড়ার যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। মাংসল পাখনাবিশিষ্ট এই মাছ ৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, আর তারা অন্যান্য মাছের মত ডিম পারে না, সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। পরবর্তীতে এই প্রজাতির আরও বেশ কিছু মাছই ধরা পড়েছে।

আগেই বলেছিলাম যে, দুই ধরণের মাংসল পাখনা বা লোব ফিনযুক্ত মাছ রয়েছেঃ কোলাকান্থ (Coelocanth) এবং লাং ফিশ (Lungfish)। এদের দুই গোত্রের মধ্যেই মাছ থেকে উভচরে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী ফসিল পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা আধুনিক অনূজীববিদ্যার পরীক্ষার ফলাফল থেকে এখন মনে করেন যে আজকের চতুষ্পদী প্রাণীগুলো আসলে লাং ফিস থেকেই বিবর্তিত হয়েছিলো(৫)। লাং ফিস

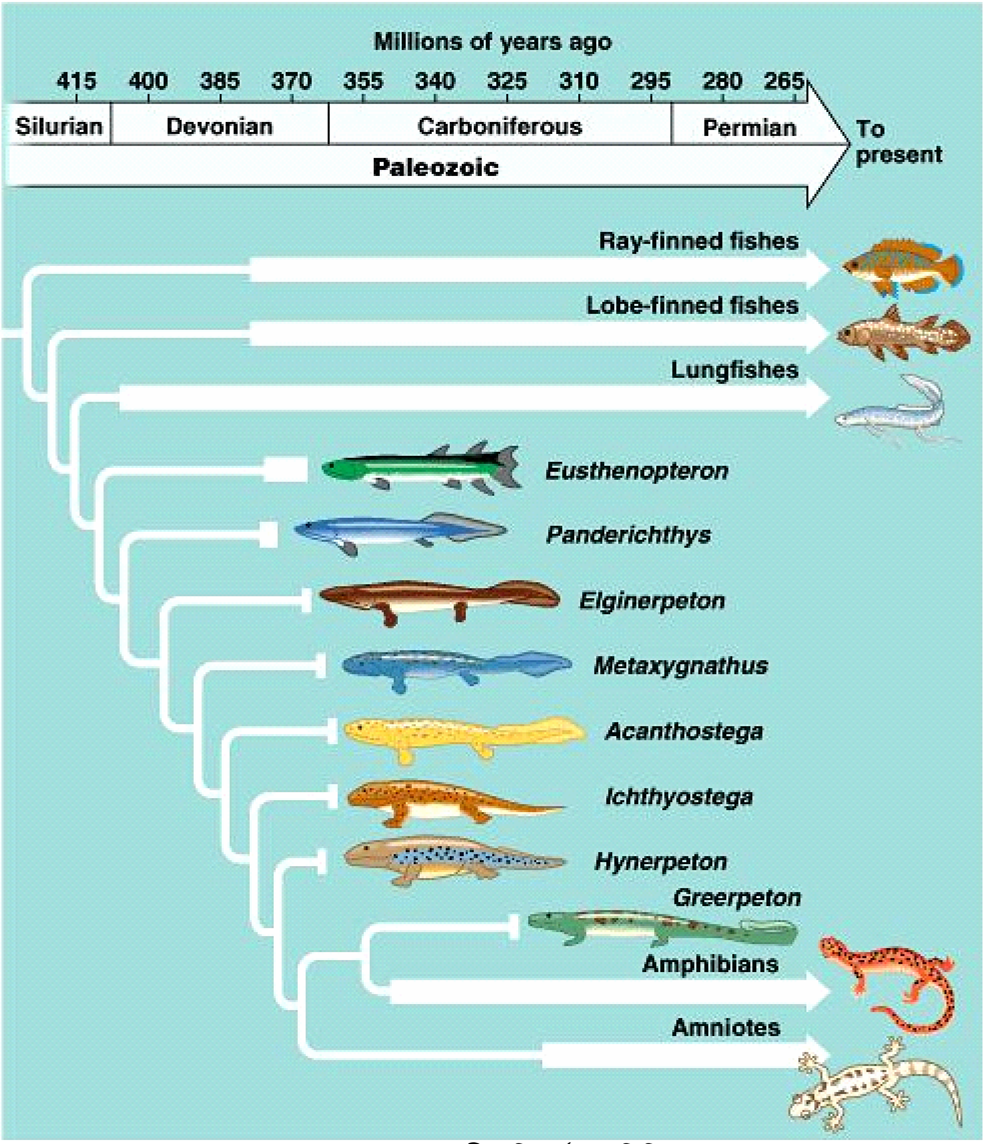

মাছ থেকে ডাঙ্গায় প্রাণীর বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর

সৌজন্যঃ http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbios/34-15-TetrapodOrigin-L.gif

থেকে উভচরে উত্তরণের এই দীর্ঘ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী ধাপগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে এমন বহু ফসিলের অস্তিতত্ব খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বেশীর ভাগ মাছের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন *Eusthenopteron* থেকে শুরু করে, অর্ধেক পানি অর্ধেক মাটিতে বাস করা *Acanthostega* র মত চতুষ্পদী প্রাণী কিংবা তার পরবর্তী ধাপের আদি উভচর (Amphibian) প্রাণী পর্যন্ত সবারই ফসিল খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা (উপরের ছবিতে বিবর্তনের ধাপগুলো দেখুন)। এই *Acanthostega* র বিড়াল বা টিকটিকির মত দিব্যি চার পায়ের অস্তিত্ব থাকলেও তখনও তার মধ্যে ফুলকা এবং সাতার কাটার জন্য প্রয়োজনীয় মাছের মত লেজটি রয়ে গেছে। এখান থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, চতুষ্পদী প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো ডাঙ্গায় উঠে আসার জন্য আলাদাভাবে তৈরি হয়নি, তাদের বিবর্তন ঘটেছিলো অনেক আগেই পানিতেই। ধাপে ধাপে ঘটা এই রূপান্তরের এতগুলো ধারাবাহিক ফসিল পাওয়া গেছে যে প্রাণীর বিবর্নের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি নিয়ে অনেকদিন ধরেই সন্দেহের কোন আবকাশই নেই। ফসিলবিদ্যার জগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ধীর গতিতে কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তনের চিত্রটির এত চমৎকার প্রতিফলন খুব কমই পাওয়া যায়।

তবে গল্পের তো এখানেই শেষ নয়, খুব সাম্প্রতিক একটা আবিষ্কারের কথা না উল্লেখ করলে গল্পটা হয়তো শেষ হয়েও ঠিক পুরোপুরি শেষ হবে না। এই তো কিছুদিন আগে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে কানাডার উত্তর মেরুতে এমনি এক মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে যা মাছ থেকে উভচর প্রাণীতে বিবর্তিত হওয়ার ধারাবাহিকতার ছকটিকে যেনো আরও পূর্ণ করে তুলেছে। কানাডার এই

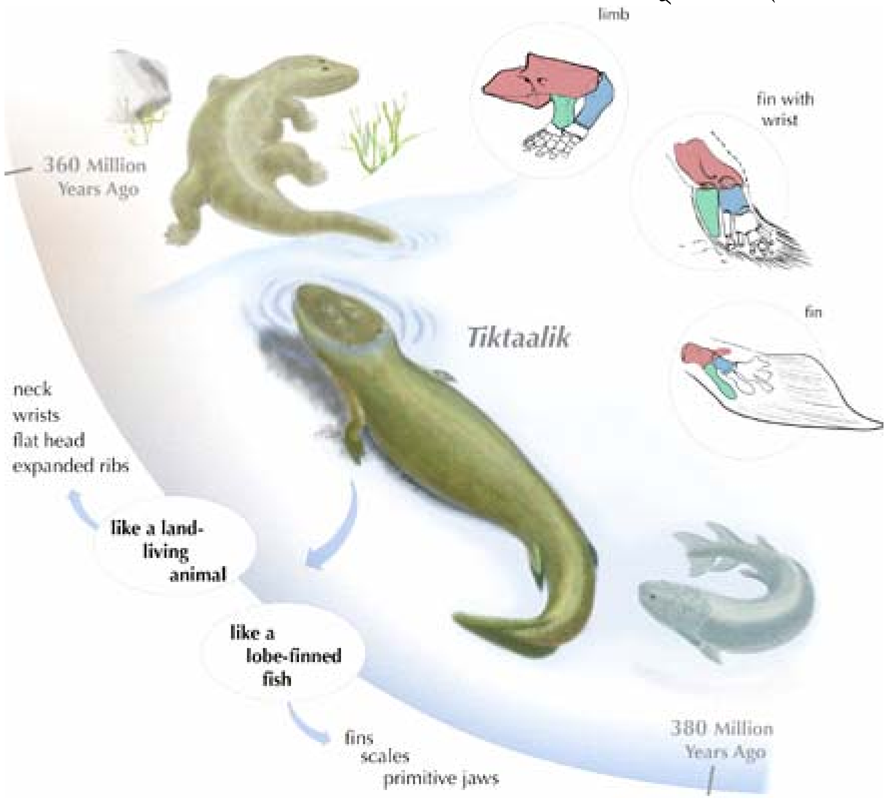

পানির মাছ থেকে মাটিতে চড়ে বেড়ানো প্রাণীর বিবর্তনের হাতে আঁকা চিত্র। মাঝখানে রয়েছে সদ্য আবিষ্কৃত টিকটালিকের ছবি যা খুব পরিস্কারভাবে মাছ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

সৌজন্যঃ Harvard University Gazette

http://www.news.harvard.edu/gazette/2006/04.06/09-missinglink.html

অঞ্চলের আদিবাসীরা অনেকটা কুমীরের মত দেখতে চার পাওয়ালা এই মাছটির নাম দিয়েছেন টিকটালিক (*Tiktaalik roseae*) (৭)। প্রায় সাড়ে ৩৭ কোটি বছর আগের এই প্রাণীটির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে মাছের মত পাখনা, আদি চোয়াল এবং আঁশ, আবার অন্যদিকে আছে চতুষ্পদী প্রাণীর মত করোটি, ঘাড়,পাঁজড়ের হাড় এবং আংশিক হাত পায়ের অস্তিত্ব! ডেভোনিয়ান যুগের মাছ '*Panderichthys*", যার মধ্যে সবে অল্প কিছু চতুষ্পদী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তখনও কিছু মাছের মত বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে এমন আদি চতুষ্পদী প্রাণী '*Acanthostega*" (উপরে মাছ থেকে ডাঙ্গায় প্রাণীর বিবর্তনের ছবিটিতে দেখুন) এর মধ্যবর্তী এক অবস্থার প্রাণী এই টিকটালিক (৮)। ফসিলের অবস্থান এবং গঠন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, এরা খুবই অল্প পানিতে অথবা কখনও কখনও এমনকি অল্প সময়ের জন্য শুকনো মাটিতেও বেঁচে থাকতে পারতো। পানি থেকে মাটিতে উঠে আসার ফলে তাদের উপর যে বাড়তি মাধ্যাকর্ষন শক্তির চাপ পড়েছে তা সামাল দেওয়ার জন্য তাদের পাঁজরের হাড়েরও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার পানিতে বাস করা মাছের কোন ঘাড় বা গলা থাকে না, তারা সমস্ত শরীর দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে শিকার করে। কিন্তু মাটিতে বাস করা চতুষ্পদী প্রাণীদের বেশীরভাগেরই নমনীয় ধরনের গলা এবং ঘাড় থাকে, বাকী শরীরের সাহায্য ছাড়াই সে তার মাথা এবং ঘাড় স্বাধীনভাবে নাড়াতে পারে। টিকটালিকের মধ্যেও এধরণের গলার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে যা দিয়ে সে সহজেই তার মাথা ঘুরাতে সক্ষম হতো। এত চমৎকার একটি মধ্যবর্তী অবস্থার ফসিল খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের মতে, এই ধরণের ফসিলগুলো মাছ থেকে ডাঙ্গার চতুষ্পদী প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে এক বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ইউনিভারসিটি অফ শিকাগোর জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান নীল শুবিনের মতে, শারীরিক গঠন এবং জীবনযাত্রার দিক থেকে বিচার করলে এই প্রাণীর মধ্যে এমনই সব মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে তা দিয়ে আজকের দিনের মাছ এবং উভচরের মধ্যে পার্থক্যগুলো যেনো বিলীন হয়ে যায়(৮)।

সদ্য পাওয়া টিকটালিকের এই ফসিলের নমুনাগুলো(৮) এত ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিলো যে এদের থেকে বিজ্ঞানীরা তাদের গঠন এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত সব তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সাধারণত এত পুরনো আমলের ফসিল্গুলো শিলাস্তরের চাপে চ্যাপটা হয়ে যায়, এরা কিন্তু তা হয়নি, এদেরকে ত্রিমাত্রিক অবস্থায়ই পাওয়া গেছে।

স্থলচর প্রাণীর বিবর্তনের এর পরের একটা বড় ধাপ হচ্ছে আবরণ বিশিষ্ট ডিম ধারণকারী সরীসৃপের উদ্ভব। আসলে সরীসৃপ, পাখি, এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সবাই এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, এরা উভচরের মত জীবনের প্রথম ধাপে পানিতে ফিরে যায় না। উভচর এবং সরীসৃপের মাঝমাঝি অবস্থার এবং আদি সরীসৃপেরও বহু ফসিল পাওয়া গেছে, যা দিয়ে উভচর থেকে সরীসৃপের উৎপত্তির ধাপগুলো স্পস্ট হয়ে ওঠে। তারপর সেই ৩৫ কোটি বছর আগের কার্বোনিফেরাস যুগ থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের টারশিয়ারি যুগের শুরু পর্যন্ত পৃথিবী জোড়া চলতে থাকে জলচর এবং স্থলচর সরীসৃপদের একক আধিপত্য (৫)। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবের বিবর্তন ঘটতে শুরু করলেও সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডায়নোসরের বিলুপ্তির আগে পর্যন্ত তাদের তেমন একটা বিকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে তাদের ধীর রূপান্তর ঘটতে থাকে, এই সময়ে বিভিন্ন ধরণের মধ্যবর্তী স্তরের 'সরীসৃপ জাতীয় স্তন্যপায়ী' প্রাণীর ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়(৫)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিবর্তনের পর্যায়ক্রমিক সবগুলো ধাপেরই বহু ফসিল খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, এই কাহিনী এতখনিই সুপ্রতিষ্ঠিত যে এখানে আর তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

তিমি মাছের উলটো পথে যাত্রাঃ বিবর্তনের কিছু কাহিনী যদি বিজ্ঞানীদের ভিষণভাবে অবাক করে থাকে তাহলে তিমি মাছের বিবর্তনের গল্পই বোধ হয় সেই তালিকার সবচেয়ে উপরে স্থান পাবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিচলিত হয়ে ডারউইন যখন বলেছিলেন যে, ভালুকের মত কোন প্রাণী থেকে তিমি মাছের বিবর্তন ঘটে থাকলেও তিনি মোটেও আবাক হবেন না, তখন অনেকেই হেসেছিলেন। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে তো বটেই! সমুদ্রে বসবাস তাদের, মাছের মতই সাতরে বেড়ায় তারা, কিন্তু মেরুদন্ড থেকে শুরু করে পুরো শরীরের গঠণটায় আবার স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত। সামনের হাতদুটো সাতারে কাজে লাগে, পিছনে কোন পা দেখা না থাকলেও শরীরের ভিতরে পেলভিসের বা বস্তিদেশের অবশিষ্টাংশ এখনও দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছে সে। ডারউইনের কথা না হয় বাদই দিলাম, প্রায় দেরশো বছর পর আধুনিক অনুজীববিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যার আবিষ্কার থেকে যখন আমরা জানতে পারি যে আসলে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে জলহস্তির পূর্বপুরুষের মত একধরণের স্তন্যপায়ী চতুষ্পদী ডাঙ্গার প্রাণী থেকে আজকে তিমি মাছের বিবর্তন ঘটেছে তখন রিচার্ড ডকিনসের মত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর পক্ষেও আঁতকে না উঠে উপায় থাকে না। তিনি ২০০৪ সালে লেখা The Ancestor's Tale বইতে লিখেছেন ‘I have now learned something so shocking that I am still reluctant to believe it, but it looks as though I am going to have to. Hippo's closest living relatives are whales.... Whales are wonders of the world. They include the largest organisms that have ever moved.... All this supposes that we believe the testimony of the molecules. What do fossils say? To my initial surprise, the new theory fits quite nicely (9)."

তিমি এবং ডলফিনদেরকে বলা হয় সিটাসিন বা cetacean, এরা স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে পানিতে অভিযোজিত হয়েছে। বিবর্তনের হিসেবে বংশ পরিচয় বিচার করলে যে কোন মাছের তুলনায় জলহস্তি, উট, গরু বা ভেড়ার সাথে তিমি মাছের আত্মীয়তা অনেক কাছের। আধুনিক অনুজীববিদ্যার জিনোমিক টেস্টের ফলাফল অনুযায়ী তো তারা জলহস্তিদের খালাতো ভাই বলেই মনে হচ্ছে। ওদিকে আবার ইউনিভারসিটি অফ মিশিগানের প্রফেসর ডঃ ফিলিপ গিংরিচ এবং তার সহযোগীরা গত ৩০ বছরের গবেষণার ফলাফল হিসেবে যেসব ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন তাও এই জেনেটিক টেস্টের সাথে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে (১১)। ইওসিন যুগে (সাড়ে ৫ কোটি বছর আগে থেকে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি বছর আগে পর্যন্ত) তিমি মাছের পুর্বপুরুষের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের বহু ফসিল আবিষ্কার করেছেন তারা পাকিস্তান এবং ইজিপ্টে। বেশ অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা খুরবিশিস্ট বিলুপ্ত প্রাণী এলোমেরিক্স (*Elomoryx*) কে সিটাসিনের পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ৭০ দশকের শেষের দিকে

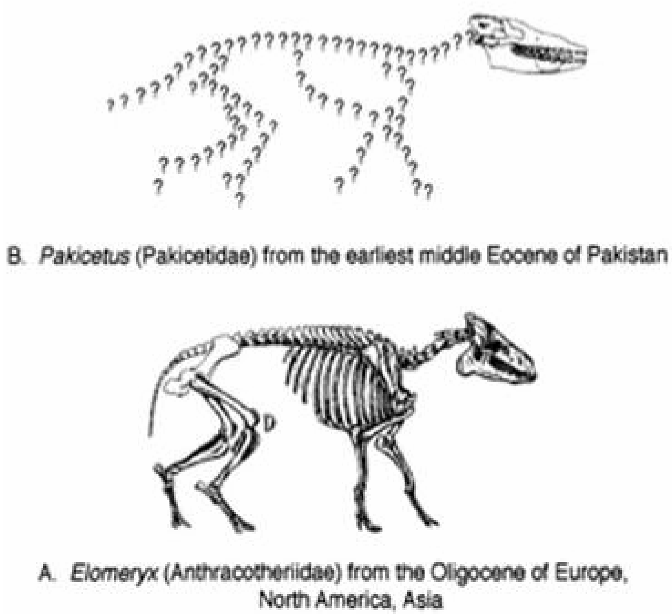

এলোমেরিক্স (*Elomoryx*), পাকিসিটাস (*Pakicetus*)
তুলনামুলক চিত্র (১১)

ডঃ গিংরিচ পাকিস্তানে তিমি মাছের সবচেয়ে পুরনো যে ফসিল পাকিসিটাস (*Pakicetus*, ৫.৩ কোটি থেকে ৪.৮ কোটি বছর আগের) এর সন্ধান পান তার সাথে এলোমেরিক্সের তেমন বেশী কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তার চেয়ে বয়সে একটু ছোট আ্যম্বুলোসিটাস (*Ambulocetus*, ৪.৮ কোটি থেকে ৪.৭

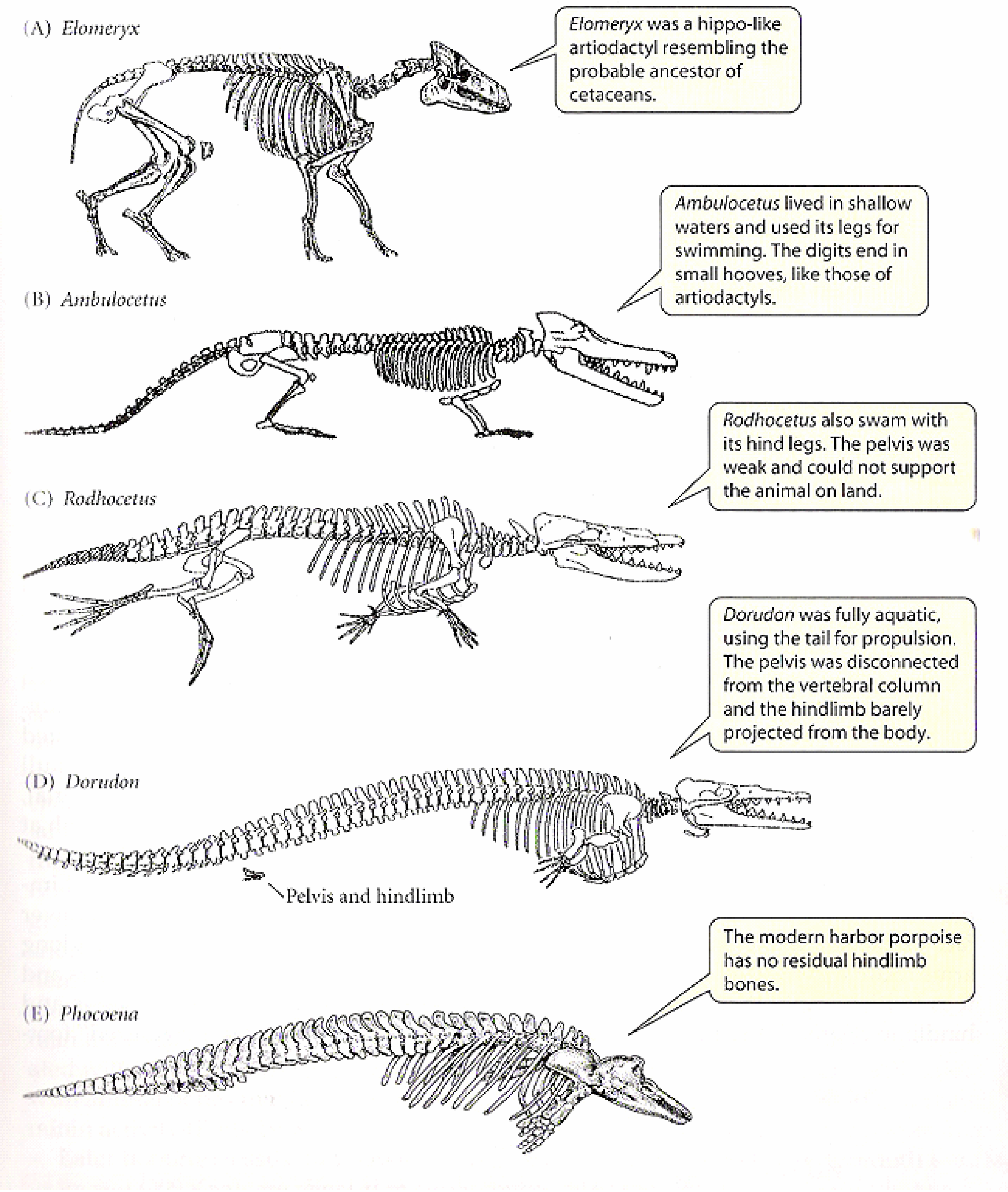

স্থলচর স্তন্যপ্যায়ী প্রাণী থেকে তিমি মাছের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের চিত্র (৩)

তাদের দৈর্ঘ্যও বাড়তে শুরু করে। তারপরের স্তরের রোঢসিটাসে (*Rodhocetus*, ৪.৯ কোটি থেকে ৩.৯ কোটি বছর আগের) এর ফসিলের গঠণ থেকে দেখা যায় যে তারা ইতোমধ্যেই উপকুলবর্তী অল্প পানির জীবনে অভিযোজিত হয়ে গেছে। এখান থেকেই ক্রমান্বয়ে কোটি বছর আগের) মেরুদন্ড এবং দাঁতের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর তার সাথে আরেকটি লক্ষনীয় জিনিষ চোখে পড়ে যে, তাদের নাকের ছিদ্র ক্রমশঃ পিঠের পিছনের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে। এখনও খুরের অবশিষ্টাংশ রয়ে গেলেও পিছনের পাগুলো যেন মাটির উপরে তাদের ভার বহন করার জন্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর পরের পর্যায়ের ফসিল ৩.৫ কোটি বছর আগের ডরুডনের (*Dorudon*) মধ্যে পানিতে সম্পুর্ণভাবে অভিযোজনের নমুনা দেখতে পাই। নাকের ছিদ্র আরও পিছিয়ে গেছে, সামনের পা ফ্লিপারের মত আকার ধারণ করছে, পিছনের পা এবং পেলভিস আর অকেজো হয়ে পড়েছে, পেলভিসটি আলাদা হয়ে পড়েছে মেরুদন্ড থেকে। তাদের সাথে আধুনিক তিমি মাছের (*Phocona*) পার্থক্য বেশ সামন্যই(৩)। তিমি মাছের এই বিবর্তঙ্কে অনেক বিজ্ঞানী ইওসিন এবং ওলগোসিন যুগের ব্যাপক জলবায়ু এবং মহাসমুদ্রগুলোর পানির গতির পরিবর্তনের সাথে জড়িত বলে মনে করেন।

ডঃ গিংরিচের দল তিমি মাছের পূর্বপুরুষ ডরুডনের প্রায় সম্পুর্ন এই ফসিলটি আবিষ্কার করেন। ইজিপ্টের ওয়াডি হিটানে পাওয়া যাওয়া এই ফসিলটি প্রায় ৫ মিটার লম্বা।
সৌজন্যঃ http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

লুসি হচ্ছে মানুষ আর এপের মধ্যে মিসিং লিঙ্ক: এর আগের আরও কিছু ফসিল পাওয়া গেলেও ’লুসি’কেই এখনও অনেকে আধুনিক মানুষ (*Homo sapiens*) এবং এপ বা বনমানুষের মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক বলে মনে করেন। ১৯৭৮ সালে তানজেনিয়ায় পাওয়া যাওয়া, প্রায় ৩২ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়ানো *A. afarensis* প্রজাতির এক মহিলার, ফসিলকেই ’লুসি’ নাম দেওয়া হয়(১৪)। লুসির প্রায়-সম্পূর্ণ ফসিল, মস্তিস্কের খুলি, পাঁজরের হাড় এমনকি সেই সময়ের পাওয়া পায়ের ছাপের ফসিল থেকে এটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যে, তারা ইতোমধ্যেই সোজা হয়ে হাটতে শিখেছিলো। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক, চোয়াল এবং শরীরের আকার তখনও কিন্তু তাদের পূর্বপুরষের মতই রয়ে গিয়েছিলো। সেজন্যই অনেকে তাদের গলার উপরে বনমানুষের মত আর গলার নীচে মানুষের মত একধরনের ’মাঝামাঝি মানুষ’ বলে অভিহিত করেন। সে যাই হোক, এ আলোচনা আপাতত তোলা থাক, এর পরের অধ্যায়ে আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ আধুনিক মানুষের বিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনের তত্ত্ব বলে, খুব ধীরে ধীরে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন ঘটে। কোন প্রজাতি যখন তার মূল প্রজাতি থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এই প্রক্রিয়া আরও তরান্বিত হতে পারে কারণ এই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে বিবর্তন ঘটতে থাকে তাদের নিজস্ব গতিতে। যদিও স্টিফেন গুলডের মত কয়েকজন বিখ্যাত ফসিলবিদ বিবর্তনের গতিতে হঠাৎ হঠাৎ উল্লম্ফন বা বড় ধরণের কোন পরিবর্তন (Punctuated Equilibrium theory)ঘটে যেতে পারে মনে করেন, বেশীর ভাগ জীববিদই কিন্তু ডারউইনের এই ধীর এবং ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াকেই সমর্থন করেন(১২)। ডারউইনও বুঝেছিলেন যে, কোন কোন সময় খুব আকস্মিক বা দ্রুত প্রাকৃতিক পরিবর্তন এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে দিতে পারে, তবে তা কোন মতেই দুই একশো বছরের ব্যাপার নয়। সাধারণ অবস্থায় যা ঘটতে লাগে লাখ লাখ বা কোটি কোটি বছর তা হয়তো ঘটে কয়েক হাজার বছরে। এর কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, চার পাশের পরিবেশ, মিউটেশনের হার, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, আকস্মিকভাবে ঘটা কোন প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা বিপর্যয়, প্রজাতির নিজস্ব জনন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সহ বহু কারণেই এর রকম ফের ঘটতে পারে। তবে কোন ভালো জীববিদই, এমনকি উল্লম্ফন মতবাদের প্রবর্তক বিজ্ঞানীরাও, মনে করেন না যে, এই পরিবর্তন এক বা দুই প্রজন্মে ঘটতে পারে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তনের যে স্তরগুলো দেখেছিলাম ফসিল রেকর্ডগুলো বলে তাও এভাবেই ঘটেছিলো। তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির মধ্যে এককেটা অবস্থা বা দশা বহুদিন ধরে বিরাজ করেছে, খুব অল্প অল্প করে হয়তো নগন্য কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কয়েক লক্ষ এমনকি কোটি বছরে, তারপর হঠাৎ করেই কয়েক হাজার বছরে অত্যন্ত দ্রুত কিছু বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভূতাত্ত্বিক সময়ের পরিপ্রক্ষিতে তাদেরকে খুব দ্রুত বলে মনে হলেও আসলে তো আমাদের হিসেবে হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, কোন পরিবর্তনই হঠাৎ করে রাতারাতি ঘটেনি। অনেক সময়ই ফসিল রেকর্ডে আমরা এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের সব ধাপগুলো দেখতে পাই না, তার কারণ এই নয় যে, হঠাৎ করে আকাশ ফুঁড়ে তাদের সৃষ্টি হয়েছে বা রাতারাতি তাদের বিবর্তন ঘটে গেছে, বোধগম্য কারণেই আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না (১৩)। আমরা ফসিল নিয়ে আলোচনার সময়ই দেখেছি যে, যত জীব এই পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়িয়েছে তাদের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশই শুধু ফসিলে পরিণত হয়েছে। তাই বেশীর ভাগ জীবের ফসিলই আমরা হয়তো কোনদিনও খুঁজে পাবো না, অথবা তিমি বা পাওয়ালা মাছ বা উড়ন্ত ডায়নোসরের মত দুই একটা মিসিং লিঙ্ক পেয়েও যাবো হঠাৎ করে, যারা কিনা হঠাৎ করেই বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মাত্রার উল্লম্ফন ঘটিয়ে দেবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

References

১। সুশান্ত মজুমদার (২০০৩), চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, পৃঃ ৯২, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।

2. Scientific American. Which Came Frist the Feather Or Birds?, March 2003 edition.

3. Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, pg.74-78 Sinauer Associates, INC, MA, USA

4. National Geographic: http://news.nationalgeographic.com/news/2004/10/1013_041013_sleepy_dino.html

5. Dr. Mark Ridley (2004, 3rd Edition), Evolution, pg. 538-542, Blackwell Publishing Company; USA, UK, Australlia.

6. Dr. Berra, M, Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism.pg 84-87. Stanford University Press, Stanford, California

7. Harvard University Gazette: April 6, 2006 edition. http://www.news.harvard.edu/gazette/2006/04.06/09-missinglink.html

8. Natural HistoryMuseum, London, England. http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2006/apr/news_7948.html

9. Dawkins, Richard (2004), The Ancester's tale, pg 196-202; Houghton Miffin Company, NY, Boston: USA.

10.http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/menace_darwinism.pdf

11. http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

12) Dr. Berra, M, Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism.pg 47-48. Stanford University Press, Stanford, California

13) Dr. Ernst Mayr(2001), What Evolution Is, pg, 13-19. Basic Books, USA.

14) http://www.talkorigins.org/faqs/homs/specimen.html#afarensis

15) Scientific American. Origin Of Birds and Their Flight? Feb 1998 edition.